মন্দির, ভক্তমন্দির ও চুড়ান্ত গন্তব্য

ডঃ রতন কুন্ডু

মন্দির শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে হিন্দু বা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয় । এর বস্তুগত দিক এর পাশাপাশি মনস্তাত্ত্বিক যে দিক গুলো আছে তা আহারীয়া অতিক্রম করে সাত্ত্বিক জগতের মাঝে বিরাট ব্যাপ্তি নির্দেশ করে । সহজ অর্থ করলে এই দাড়ায় যে, মানুষের জৈবিক প্রয়োজন, পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সুখের মধ্যে সীমাবন্ধ । জঠর ইন্দ্রিয়ের তুষ্টির জন্য আমাদের খাবার খেতে হয়, সুগন্ধ চিত্তকে আচ্ছন্ন করে, পার্থিব সৌন্দর্য্য দৃষ্টিনন্দন হয়ে সুখানুভূতি তৈরি করে, সুরেলা শব্দ মনকে আলোড়িত করে, স্পর্শসুখ দৈহিক মোক্ষলাভে সাহায্য করে । আর এর সবগুলোই হচ্ছে বস্তুগত । এর বাইরেও মানুষের মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজন ও আত্মার অভাব পূরণের জন্য অর্থাৎ বস্তুগত চাহিদার বাইরেও এক বিরাট শুন্যতা পুরনের জন্য যা প্রয়োজন, তা হলো সাত্ত্বিক উপাদান । ছোট্ট একটি উদাহরন দিলে বিষয়টি অনেকটা পরিষ্কার হবে । আমার এক বন্ধু ঢাকা সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবি । কোন এক শুক্রবারে তার হোন্ডা মাটর সাইকেলটি নিয়ে আমার মালিবাগের বাসায় হাজির । চা পর্ব শেষ হতেই প্রস্তাব করল -ফ্রি থাকলে চল ঘুরে আসি । আমি জিগ্যেস করলাম কোথায় ? চেয়ার থেকে উঠে মুচকি হেসে বললো -চলো গিয়েই দেখবে । আমি তার মোটর সাইকেলের পেছেনে উঠে বসতেই সে যে জায়গায় আমাকে নিয়ে গেল আমি তো হতবাক । হতবাক আপনারাও হবেন । কারন জায়গাটি সবারই পরিচিত এবং অনেকটাই বিতর্কিত। সে আমাকে নিয়ে হাজির হলো হাইকোর্টের মাজারে । আমি হাসবো না কাঁদবো কিছু ভেবে ওঠার আগেই বলল -আমার পাশে চোখ বন্ধ করে দশটা মিনিট বসো । নির্ধারিত সময় চোখ বন্ধ করে বসে থাকার পরে আমাকে বলো এখানে আসার আগে এবং পরে তোমার মনের প্রতিক্রিয়ার কোন পরিবর্তন হয়েছে কি না ? বলে রাখা ভালো আমার বন্ধুটি সাম্যবাদের একজন প্রবক্তা। ছাত্র জীবনে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কমরেড ছিলেন আর আমি ছোটবেলা থেকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ পড়ে পড়ে ধর্মকে একটি আফিমের বড়ি ছাড়া কিছুই ভাবতে পারতামনা । সেই দুজন চোখ বন্ধ করে কোন এক পীড় এর কবরস্তানের পাশে ধ্যান মগ্ন ! দশ মিনিট পার হতে দশ যুগ সময় লাগল । যখন চোখ খুললাম বন্ধুটি বললো -কি দাদা কেমন লাগছে ? সত্য বলতে কি চোখ বন্ধ থাকাতে আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পাশাপাশি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করলাম আগত সবাই এ পার্থিব জঞ্জাল থেকে পরিত্রানের জন্য- তাদের আত্মার শান্তির জন্য, মাজার এর চারপাশে বসে প্রার্থনা করছে এবং জেকের শেষে একটা প্রশান্তি নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের কমরেডদের মূল স্লোগান ছিল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র। অর্থ্যাৎ সমাজতন্ত্রের আধুনিকীরন, যা মাও সে তুং করেছিলেন। বন্ধু দার্শনিকের মতো বললো -"মনের প্রয়োজনে একদিন তিয়ান আর মান স্কয়ার, রেড স্কয়ার হবে উপাসনালয়ের চাতাল, আর ক্রেমলিন, হোয়াইট হাউজ হবে সবচে' বড় উপাসনালয়"

ঈশ্বর নামের কোন অশরীরির মহিমার প্রয়োজন অনুভব করলাম । বস্তুগত উপাদান যা পুরন করতে পারেনা, বিশ্বাস ও বোধ সেই বিশাল শূন্যতা পুরন করতে সক্ষম । মৃত্যুর পরে আমি স্বর্গে কিম্বা বেহেস্তে যাব কিনা সে চিন্তা করিনা । ভেবে কষ্ট পাই না দোজখে নিয়ে নরকযন্ত্রনা ভোগ করবো কিনা । ছোট বেলায় সংস্কৃত শিক্ষকের কাছে শেখা শ্রীমদ্ভবগত গীতার সেই স্লোগটি মনে পড়ে গেল । ভগবান শ্রী কৃষ্ণ বলেছেন-
"সর্ব ধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরনংব্রজ
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্য মোক্ষয়িষ্যামি মা সূচ"

অর্থ্যাৎ সব ধর্ম ছেড়ে শুধু আমার শরনাপন্ন হও । আমি তোমার সব পাপ- গ্লানি মুছে তোমার মোক্ষলাভে সাহায্য করবো । আমি নির্মল সেন, জোতি বসু, বুদ্ধবাবুদের মত বড় বড় কমরেডদেরও দেখেছি মন্দিরে গিয়ে সাষ্টাংগে প্রনাম করতে । আমি মনে করিনা তারা শুধুমাত্র ভোটের আশায় ধর্মপ্রান ভোটারদের খুশী করার জন্য এ কাজটি করেছেন । এ কাজটি করতে গিয়ে তারা নিজের বিবেকের কাছে দায়বন্ধ হয়ে গেছেন । একজন ঈস্বরের প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি করতে পেরেছেন । তাঁর অস্তিত্ব টের পেয়েছেন । আর এই অবদান হল সাধারন একটি ঘর যার নাম মন্দির । যার মাঝে অধিষ্ঠিত আছে মাটি, পাথর অথবা অন্য কোন উপাদান দিয়ে তৈরী একটি বা একাধিক মূর্তি । কোন এক চারন কবি বলেছিলেন-
" মূর্তি পূজা করেনা হিন্দু কাঠ মাটি দিয়ে গড়া মৃন্ময়ী মাঝে চিন্ময়ী হেরে হয়ে যাই আত্মহারা"

যার সহজ অর্থ করলে এই দাড়ায় যে তুমি তেমার চর্ম চোখে দেখছ হিন্দুরা কাঠ আর মাটি দিয়ে প্রতিমা বানিয়ে পূজা করছে কিন্তু সেই কাঠ আর মাটির অন্তরালে যে বিরাট শক্তিধর অশরীটি বসে আছেন তাকে দেখছোনা । এই শক্তির নাম অদ্যাশক্তি । সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মৌলবাদিরা বারবার হাজার হাজার মন্দির ভেংগে ফেলেছে, কিন্তু কি লাভ হয়েছে ? বস্তুগত অবকাঠামো তুমি ধংস করতে পার, কিন্তু হৃদয়ের অর্থ্যাৎ মনস্তাত্ত্বিক জগতকে তুমি একটুকুও আচঁর কাটতে পারবে না । মন্দির হল একটি উপলক্ষ্য । এই বস্তুগত অবকাঠামোকে ঘিড়ে একটি মনস্তাত্ত্বিক আরাধনাস্থল গড়ে উঠে । আমি আমার এক পুরোনো নিবন্ধে লিখেছিলাম- মন্দির এর অবকাঠামো, প্রবেশদ্বারের ঘন্টা, আলপনা, ভাষ্কর্য্য , পুজা মন্ডপ, বেদীমূল, ধুপ, দ্বীপ, নৈবদ্য এসব ভক্তির আবাহন করে । আত্মাকে পরমাত্মার সাথে যোগসুত্র স্থাপনে সাহায্য করে । যাঁরা যাজ্ঞিক কিংবা সন্যাশী অথবা মন্দির বিকেন্দ্রীক তাঁরা আরাধনার এক পর্যায় অবলম্বন করেন । তবে সর্বসাধারনের জন্য মন্দির এর বিকল্প নেই ।

হিন্দু ধর্মে "যত মত তত পথ" এই উপলব্ধিটি সর্বাংশে প্রযোজ্য । যে কেউ, যে কোন জায়গায় বসে, যখন তখন ইশ্বরের উপাসনা করতে পারে এবং ঈশ্বর তা শুনবেন। তার পরেও মন্দির যে আবহ তৈরি করতে পারে, কোন নির্জনতা, জংগল, পাহার, পর্বত, নদী, সাগর তা পারেনা। শুধুমাত্র যারা ভক্তি মার্গের উচ্চস্বরে পৌছে গেছেন তারাই শুধুমাত্র মোক্ষলাভের আশায় নির্জন সাধনায় ব্রতী হন। সনাতন ধর্ম, বর্তমান পৃথিবীতে পর্যন্ত যতগুলো সুসংহত ও গ্রন্থিত ধর্ম চালু আছে তার মধ্যে প্রাচীনতম । ভরতমুনির জন্ম যীশুখৃষ্টের জন্মের কয়েক হাজার বছর পূর্বে । সনাতন ধর্মের প্রাচীন গ্রন্থের সমাহার- বেদ । চারটি মূল বেদ, আনুসংগিক বেদ ও পুরাণ ধর্মের মূল চালিকাশক্তি । সময়ের প্রয়োজনে ধর্মের আহারীরার পরিবর্তন হয় কিন্ত মূল ভাব বা দর্শন অপরিবর্তিত থাকে । মূল দর্শন অনেকের পক্ষে বোঝা সম্ভব হয়না বিধায় যারা বেদ অধ্যয়ন ও গবেষনা করতেন তাদের যৌক্তিক ব্যখ্যা ধর্মকে আধুনিকায়নে অনেক সাহায্য করেছে । এরই ধারাবাহিকতায় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সহ আরও অনেক মনিষীবৃন্দ এর আধুনিকায়ন ও বিশ্বায়নে যে ভুমিকা রেখেছেন তা প্রনিধানযোগ্য । সব গ্রন্থের নির্যাস নিয়ে শ্রী মৎ ভগবত গীতা, শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত ও অন্যান্য গবেষনাগ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করেছে । অষ্টবিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন রায়, এক ইশ্বরের আদর্শ প্রচার করলেও তার প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দেন মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর- ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে । এ কথাগুলো বলার কারন হল, সেই অতি প্রচীন সনাতন ধর্ম মত ও পথের ভিন্নতার কারনে বিভিন্ন ছোট ছোট প্রক্রিয়ার অনুশীলিত হয়ে আসছে । কিন্ত শিখ, জৈন, শাক্ত, যাজ্ঞিক, অথবা অন্য অনুসারীরা হিন্দু অথবা সনাতন ধর্মের ছায়াতলে অবস্থান করেই পূজা অর্চনা করে আসছে । মত ও পথের ভিন্নতা থাকলেও আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ এক। শত শত দেব দেবী পূজিত হলেও ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। এক জন ফরাসী মনীষী বলেছেন যে, এই আধুনিকতা যে ধর্ম মেনে নিতে পারেনা, সে ধর্ম ধর্মই নয় । অধিকাংশ সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মচর্চ্চার মূখ্য উপজীব্য হচ্ছে মন্দির । তাদের প্রতি ঘরে ঘরে, বাড়িতে বাড়িতে, মহল্লায় মহল্লায় , নদীর কিনারায়, পর্বতের চুড়ায় কিংবা গহীন বনেও মন্দির বিনির্মিত হয়েছে । কিন্তু

নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে সিডণীতে হাজার হাজার বাংগালী হিন্দুর বসবাস হলেও অদ্যাবধি তাঁরা কোন কমিউনিটি মন্দির তৈরি করতে পারেননি । এ না পারার পেছনে তাদেও মধ্যিকার দ্বিধা বিভক্তি, অভ্যন্তরীন কোন্দল, অধিপাত্য বিস্তার, অহংবোধ, জাতিভেদ, কৌলিন্যবোধ, অসহনশীলতা, ব্যক্তিচিন্তা এবং সর্বোপরি অসহযোগীতাই বহুলাংশে দায়ী । এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সিডণিতে পা রাখতেই এক বন্ধুর মুখে শুনলাম যে, রিফিউজি মাইগ্রান্ট ইসুতে বাংলাদেশ পূজা এসোসিয়েসনকে দু টুকরা করা হয়েছে। পরবর্তীতে দেখলাম, চর দখলের মত পূজা সোসাইটি দখল করতে এসে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রীরা মামলায় জড়িয়ে পরে । লেলিনবাদীদের মামলায় জিতে তাথৈ নৃত্য শেষ করার আগেই আবার ব্যক্তি প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার লড়াই শুরু হয়। ধর্ম ও বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা ও ত্যাগের মনেবৃত্তি না থাকার কারনেই এই বিভক্তি এবং যে কারনে বিগত দুই দশকেও কেউ মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।

এবারে আসি ভক্ত মন্দির প্রসংগে। সিডনীতে নবাগত কিছু উঠতি তরুন হিন্দু সমাজের এই দৈন্য দশা ও করুন পরিনতি দেখে বুকে অসীম সাহস নিয়ে এগিয়ে আসে। ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহন করে তারা উপলব্ধি করতে পারে যে নথিভূক্ত ইনকরপোরেটেড সংগঠন করে কার্যকরী কমিটির মাধ্যমে পূজা করা যেতে পারে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা যেতে পারে কিন্তু মন্দির নয়। তাই তাঁরা মাত্র পাঁচজন মিলে একটি ট্রাষ্টি সংগঠনের পরিকল্পনা করলেন। ট্রাষ্টের সাধারন সদস্যরা হবেন মূল চালিকাশক্তি, আর্থিক যোগানদাতা ও প্রকৃত অংশীদার হবেন সকল সদস্যবৃন্দ। প্রচুর সাড়া পেলেন তারা। সংগঠন পরিকল্পনার দু'বছরের মাথায় সিডনীর অদুরে প্যারামাটার হ্যারিস পার্কে মন্দির এর জন্য জায়গা ক্রয় করে ফেলেছেন। জায়গায় জমি উন্নয়ন ও বাউন্ডারী ফেন্স লাগানো হয়ে গেছে। ট্রাস্টের ফাইন্যান্সিয়ার সদস্যের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। কথা হয়েছে ট্রাষ্টের সুমন সাহা, অশোক কুন্ডু, ডা: সুব্রত বিশ্বাস, বিধান চক্রবর্তী, ডাঃ জয়ন্ত কর ও অন্যান্যদের সাথে। একটি ব্যাপার তারা সবাই স্পষ্ট করে জানালেন যে এ মন্দির কোন ব্যক্তি মালিকানায় হবেনা, গোষ্ঠী মালিকানায় হবেনা। ভক্তরাই হবেন এর প্রকৃত মালিক। তাদের পরামর্শে তাদের ইচ্ছায় মন্দিরের অবকাঠামো, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাসহ অন্যান্য সব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হবে। কথা হয়েছে আমার অনেক বন্ধুদের সাথেও। তারা একবাক্যে স্বীকার করেছে যে "ওরা পারবে" আমরাও এককালীন কিংবা কিস্তিতে অনুদান দিয়ে এই মহৎ উদ্যোগের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করব। একজন ট্রাষ্টি জানালেন এক ব্যক্তির কাছ থেকে ৫০ হাজার নয় বরং ৫০ ব্যক্তির কাছ থেকে একহাজার করে অনুদান পেলে ভক্ত মন্দির বেশী ধনী হবে। তিনি বল্লেন ভক্তদের সহযোগীতা পেলে এ বছরের মধ্যেই মন্দির নির্মান শুরু করা যাবে। তিনি সবাইকে উদার মন নিয়ে মুক্ত হতে সাহায্য করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

এর পরে আসি চুড়ান্ত গন্তব্য বা Ultimate Destination প্রসংগে। সিডনীতে অভিভাষন নিয়ে আসার পরে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও পারলৌকিক ক্রিয়ার জন্য ততটা চিন্তা করিনি যতটা চিন্তা করেছি অর্থ উপার্জন, সম্পত্তি ক্রয়-সংরক্ষন ও অন্যান্য সামাজিক কর্মকান্ডে। ব্যস্ততম জীবনের কোন একদিন খবর পেলাম মা পরলোক গমন করেছেন। ধিক্কার এলো নিজের প্রতি। মায়ের ঔরষজাত সন্তান হয়েও তার ইহধাম ছেড়ে যাওয়ার সময় একমাত্র ছেলে সন্তান হয়েও তার পাশে থাকতে পারলাম না। বন্ধু বান্ধব অনেকে এসেছেন সহানুভূতি জানাতে, সাথে অনুদান হিসেবে দুধ, কলা, সাবু, ফল, মূল, ধূতি, গেঞ্জি ইত্যাদি নিয়ে এসেছেন। গুরুদশা শেষে ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী বিদেহী আত্মার সদগতির জন্য শ্রাদ্ধ সম্পাদন করা সন্তানের জন্য অবশ্য করনীয়। কাছের সবাইকে নিয়ে আলোচনায় বসলাম। দীর্ঘ রাত অবধি আলোচনা চলল। আলোচনায় কিছু কিছু উপদেশ, নির্দেশ আমার কাছে খুবই শ্রুতিকটু মনে হয়েছে। কাকে কাকে নিমন্ত্রন করা যাবে, কাকে যাবেনা, কার কার পরিবারের এক দুই জনকে

আর কার পরিবারের সাবইকে নিমন্ত্রন করতে হবে কিংবা খাদ্য তালিকায় কি কি থাকবে, কি কি না বললেই নয় এবং আরও অনেক স্থুল প্রস্তাবনা। পরে সিদ্ধান্ত নিলাম নর্থ সিডনি ইস্কন মন্দিরে শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করব। সবাই প্রসাদ পাবে। অনেকেই এই উদ্যোগের প্রসংশা করেছেন। এরপর আমার বাবা-মার দিবসী সহ অনেক অনুষ্ঠানই ইস্কন মন্দিরে করেছি। আমার মনেও একটি সুপ্ত আশা আছে। সেটি হল আমার মৃত্যুর পরে যেন আমার কাছের সবাই আমাকে সমাহিত করে। আমার শ্রাদ্ধ যেন আমাদের মন্দিরেই হয়। আমাদের মন্দির যেন সকল পূজা, অর্চনা, মনস্তাত্ত্বিক ও পারলৌলিক ক্রিয়ার মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়।